শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-লীলামৃত

শ্রীপাট-অম্বিকা

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-শ্রীমন্দিরের
সেবাইত—
শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুজীউ-শ্রীমন্দির হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীপাট-অম্বিকা।
কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)

ভিক্ষা—পাঁচ আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী
শ্রীপাট-অম্বিকা।
কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)।

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়।
প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নিবেদন

শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-প্রেম খেলা একটী অতি মুখ্য লীলা, তাহা যে সকলেরই জ্ঞাত আছে, ইহা সুনিশ্চয়। শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের নাম "ভুবন-ভরা" হইয়া রহিয়াছে। পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শনে বৎসর ব্যাপি বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বহু ভক্তকেই শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-লীলা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে ইচ্ছুক দেখা যায়। অবশ্য প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে সর্ব্ব বিষয়ই বর্ণিত আছে; কিন্তু সকলের পক্ষে সর্ব্ব বিষয় জানা সম্ভবপর নহে। শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-লীলাভিজ্ঞ দর্শক-গণকে অজস্র ধারায় চোখের জল ফেলিতে দেখা যায়; আর যাঁহারা লীলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তাঁহারাও লীলা বর্ণনা কিঞ্চিৎ শ্রবণান্তেই আর চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারেন না। এইরূপে ভক্তগণের এই লীলা-বর্ণনা শ্রবণ-লিপ্সাই আমাকে বর্ত্তমান লীলা-প্রবন্ধ লিখিতে অনুপ্রাণিত করে।

পরম বৈষ্ণব দানবীর স্বর্গীয় রাজা হৃষিকেশ লাহা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পরম ধর্ম্মপ্রাণ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম, এ; পি, এইচ, ডি, মহাশয় এবং পরম ভক্তপ্রবর বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ, মহাশয় তাঁহাদের বিখ্যাত

"সুবর্ণ-বণিক সমাচার" মাসিক পত্রিকায় এই লীলা-প্রবন্ধটী প্রচার করিয়া ভক্তের প্রাণে যে প্রচুর আনন্দ দান-জনিত মহাপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকই তাহার প্রমাণ। অর্থাৎ উক্ত মাসিক পত্রিকায় "শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর" শীর্ষক আমার এই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইলে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য বহু ভক্ত আমাকে কৃপানুরোধ করিতে থাকেন। কিন্তু আমার ন্যায় মা লক্ষ্মীর কাঙ্গাল ছেলের পক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা নির্ব্বাহান্তে পুস্তক প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহ করা বড়ই দুরূহ সমস্যা। যাহা হউক শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শক্তি সঞ্চারণের ফলে এবং বৈষ্ণব ও ভক্তগণের অহৈতুকী কৃপাবলেই সফলতার আশায় উদ্দিপীত হইয়া ইহা সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলাম।

এই পুস্তকে আমার নিজের কথা কিছু নাই। সকলই প্রাচীন গ্রন্থ মূলে লিখিত। পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছি। ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হেতু শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম এবং উহার অনুবাদ দিবার চেষ্টা পাইলাম। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী, তাঁহার কৃপা ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব; আমার ন্যায় মূর্খের উহা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেই কারণ লিখিলাম "চেষ্টা পাইলাম"। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যেমন বলাইলেন সেই মত বলিলাম। বৈষ্ণবগণ ইহাতে আমার কোনও অপরাধ লইবেন না।

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীর বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

উক্ত "শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর" শীর্ষক প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াই পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।

পুস্তকখানি যাহাতে সকলের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, সেই আশায় ইহা অতি সামান্য ভিক্ষায় বিতরিত হইল। ভক্তগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার সাধিত হইলে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

জয় গুরু! জয় গুরু!! জয় গুরু!!!

শ্রীশ্রীঝুলন পূর্ণিমা।
শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-শ্রীমন্দির
শ্রীপাট-অম্বিকা।
সন ১৩৪৪ সাল।

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাসানুদাস
শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী

শ্রীপাট-অম্বিকায়

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস সম্মিলন-স্থান।

৫০০ শত বৎসরের প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষ।

ইহার নিম্নে সাদা কুঠারীর ভিতর শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের প্রস্তর-নির্মিত ভজন-সিংহাসন আছে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং প্রণমাম্যহং।

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস-লীলামৃত

— প্রথম উচ্ছ্বাস —

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ।

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ,
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রীকাল সত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকল ত্রায়তে নমঃ॥

ধর্ম্মই জগৎকে ধারণ করেন। পুষ্পমালা যেমন সূত্র দ্বারাই ধৃত হয়, সূত্র ছিন্ন হইলে কুসুমসকল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ জগৎ ধর্ম্মরূপ সূত্রের দ্বারাই ধৃত বা অবস্থিত থাকে। ধর্ম্মশূন্য জগৎ এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। আবার ভক্তিই সেই ধর্ম্মের জীবনস্বরূপ, সুতরাং ভক্তিই পরম ধর্ম্ম। জগতে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন শ্রীভগবান্ অংশে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্মাদি স্থাপন করেন; আর যখন সকল ধর্ম্মের জীবনস্বরূপ ভক্তিধর্ম্মের—প্রেমধর্ম্মের

প্রবর্ত্তন জগতে প্রয়োজন হয়, তখন অংশী স্বয়ংই ধরাধামে প্রকট হইয়া প্রথমে জগতে তাহা সংস্থাপন করেন ও পরে পুনরায় নিজ আবির্ভাব বিশেষে জগতের ভাগ্যে উদয় হইয়া সেই পূর্ব্বসঞ্চিত প্রেমভক্তি অজস্রভাবে 'সর্ব্বজীবকে দান করিয়া থাকেন। সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অতীত দ্বাপর যুগে যে প্রেম ব্রজ-ভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় নিজ আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সপরিকর সেই প্রেমধর্ম্ম জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্য—সকল জীবকে অজস্রভাবে দান করিয়া শ্রীভগবানের সকল স্বরূপের মধ্যে পরম উদাররূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন; যেহেতু এরূপ অত্যাশ্চর্য্য উদারতা ও জীব-জগতের প্রতি এত বড় মহান্ কৃপা-বিস্তার জগতের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই।

জগৎ যখন ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, বাণীর পীঠস্থান-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিতসকল যখন নীরস, শুষ্ক হেতুবাদ, বাকবিতণ্ডা লইয়া কালক্ষয় করিতেছিলেন, সাধারণ লোক-সকল যখন ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া বামাচার, কদাচার প্রভৃতি লইয়া মত্ত ছিল; নানাপ্রকার অনাচার—অবিচার—অত্যাচারে দেশ যখন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, জগাই-মাধায়ের ন্যায় অবিদ্যা ও অহমিকার তাণ্ডব যখন দেশের সভ্যতাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল, দেশের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে জীবদুঃখে বিগলিতপ্রাণ্ শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর কাতর

আহ্বানে গোলকে শ্রীভগবান্ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহা ভিন্ন তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হইতে।
আমা বিনা কেহ নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অতএব জগতে সেই ব্রজ-প্রেমধর্ম্ম প্রচারের সময়ও সমাগত জানিয়া গোলকবিহারী, পূর্ণব্রহ্মসনাতন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে শ্রীশচীমাতার গর্ভসিন্ধু হইতে শ্রীগৌরচন্দ্ররূপে উদিত হইলেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন শ্রীচৈতন্যরূপে নিজ ভাব বিশেষ আস্বাদনের সহিত নিজ নাম ও প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করিতে আসিলেন, তখন সঙ্গে আসিলেন ব্রজের সেই পূর্ব্বপরিকর ও পারিষদ্গণ,—যাঁহারা শ্রীনবদ্বীপলীলায় চৌষট্টি মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, অষ্ট কবিরাজ, ছয় গোস্বামী নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাপরের শ্রীব্রজ-লীলায় শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যেমন উভয়ে অভিন্ন কলেবর হইয়া প্রকাশ-ভেদে ভিন্ন মাত্র ছিলেন, কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-সখাগণেব মধ্যে দ্বাদশ জন,—যাঁহারা কলিতে দ্বাদশ গোপাল নামে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীসুবলই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।*

শ্রীকৃষ্ণলীলা মাধুর্য্য যে কত বেশী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এই শ্রীসুবল, তাহা বৈষ্ণব-গ্রন্থেই পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রাণের কাতরতা শ্রীসুবলকেই অধিক পরিমাণে বলিয়া তাহা নিবারণ করিতেন। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-মিলনে অতি তৎপর এই শ্রীসুবলকে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অন্য উপায় ছিল না। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলন-কুঞ্জে যেখানে সখিগণের পর্য্যন্ত অবস্থান করিবার অধিকার ছিল না, সেখানে এই শ্রীসুবলকে আমরা শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন সময়ে তাঁহাদের সেবারত অবস্থায় দেখিতে পাই।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সহায়-ভেদে ৭ম অঙ্কে আছে ঃ—

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্যললনাং ক্রীড়াকলি প্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
কঃ শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতিঃ॥

শ্রীসুবলের গুণবর্ণনা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর কি করিবে। ভক্তিরত্নাকরে যথার্থই লেখা আছে,—

"শ্রীসুবল কৃষ্ণ প্রিয় পরম সুন্দর!
যাঁর চরিত্রাদি যত্নে বর্ণে বিজ্ঞবর॥"

এই শ্রীসুবলই কলিযুগে শ্রীনবদ্বীপলীলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত নামে পরিচিত।

"শ্রীসুবল গৌরীদাস বিদিত সর্ব্বত্র।
অভিন্ন চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রিয় পাত্র॥"

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে,—

"সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।"

অন্যত্র,—

"পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাস গুণান্বিতং।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রিয়মহং ভজে॥"

শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে,—

"প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল।"

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থে,—

"সুবল করিয়া যারে পুরাণে কহিল।
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে সকলে জানিল॥"

শ্রীঅনন্ত সংহিতায়,—

"সুবলো মে প্রিয়সখো গৌরীদাসাখ্যপণ্ডিতঃ।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

"গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥

শ্রীগৌরীদাসের পৈত্রিক বাড়ী শালিগ্রামে। বাল্যকাল হইতে গৌরীদাস বড় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন, কি করিয়া একাগ্রচিত্তে কেবল কৃষ্ণ-ভজন করা যায়। সুযোগ অল্প দিনের মধ্যেই মিলিয়া গেল। যিনি গৌরলীলা বিশদভাবে প্রকট করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সুযোগ মিলিতে কি আর সময় লাগে? যখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণ-প্রেমে নবদ্বীপকে ভাসাইয়া শান্তিপুর

প্রায় ডুবাইতে চলিলেন, তখন আমাদের চিরভক্ত গৌরীদাসের প্রাণেও টান দিলেন। শ্রীগৌরীদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া শালিগ্রাম হইতে অম্বিকায় চলিয়া আসিলেন। এত জায়গা থাকিতে তিনি কৃষ্ণ-ভজনের জন্য অম্বিকা যে কেন স্থির করিলেন, তখন তিনি নিজেই তাহা জানেন না। যাঁহার ইচ্ছায় তিনি সংসার মায়া কাটাইয়া চলিয়া আসিলেন, তিনিই তাঁহাকে যেন কাণে কাণে বলিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ-প্রেমে নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছে, শান্তিপুরও ডুবিতে চলিল,—সেই প্রেমের ঢেউ ঐ দুই জায়গার মধ্যবর্ত্তী স্থান অম্বিকাকেও ভাসাইবে ; অতএব কুলুষনাশিনী, পতিত-পাবনী ভাগীরথিস্পর্শে চিরপবিত্র সেই অম্বিকা নগরী কৃষ্ণ ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া তিনি নির্ণয় করিলেন। শ্রীগৌরী-দাস অম্বিকায় আসিয়া এক আমলী (তেঁতুল) গাছ তলায় কুটির নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জনে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-ভজনে রত হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন ভজনের পর শ্রীগৌরীদাস হঠাৎ একদিন দেখিলেন যে এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি নৌকার একখানি বৈঠা স্কন্ধে লইয়া গঙ্গাতীর হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। সেই মূর্ত্তি আরও কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি মনে করিলেন— এই কি আমার প্রাণের ঠাকুর, এই কি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব ; এরূপ মূর্ত্তি'ত মানবের কখনও সম্ভবপর নহে ; যাঁহাকে আজ এতদিন ধরিয়া ডাকিতেছি, যাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ

আমার এত কাতর—সেই প্রভু কি আমার কুটির দ্বারে স্বয়ং আসিলেন?—শ্রীগৌরীদাস প্রচুর আনন্দে, বিহ্বলচিত্তে, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ততক্ষণে শ্রীশচীনন্দন তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত! আমি শান্তিপুর হইতে হরিনদী গ্রামে আসিয়া নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইলাম। এই বৈঠা দিয়া আমি নিজেই নৌকা বাহিয়াছি। এই বৈঠা তোমাকে দিলাম,—তুমি এই বৈঠা দ্বারা জীবগণকে ভবনদী পার করিয়া উদ্ধার কর।" শ্রীগৌরীদাস যখন নিজ কর্ণে ভক্তের ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের আদেশ শুনিলেন এবং যখন বুঝিলেন যে নবদ্বীপের শ্রীনিমাই তাঁহার সম্মুখে, তখন তিনি আনন্দমত্ত অবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণে পড়িতে গেলেন, অম্‌নি প্রভু তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরীদাসের মনে শঙ্কা হইতেছিল যে, তিনি প্রভু-দত্ত বৈঠা লইবার উপযুক্ত কি না,—প্রভুর প্রেমালিঙ্গনে তাহার সে শঙ্কা ঘুচিয়া গেল। শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্য তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিলেন। তিনিও সেই শক্তি দ্বারা প্রভু-দত্ত শ্রীবৈঠা মাথায় উঠাইয়া লইলেন।

"একদিন শান্তিপুর হইতে গৌররায়।
গঙ্গা পার হৈয়া আইলেন অম্বিকায়॥
পণ্ডিতে কহয়ে শান্তিপুর গিয়াছিলু।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু॥

গঙ্গাপার হৈলু নৌকা বহি এ বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমায়॥
ভবনদী হইতে পার করহ জীবেরে।
এত কহি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে॥”

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীগৌরীদাসের আজ আর আনন্দ ধরে না। একে তিনি একজন কৃষ্ণভজক গৌর-পারিষদ্, তাহাতে আবার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য তাঁহার সম্মুখে; তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রীবৈঠা মস্তকে রাখিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে নৃত্য দেখিয়া পশুপক্ষিজীবগণ সকলেই আনন্দে ডগমগ। কিছুক্ষণ নৃত্য করিবার পর প্রভু পণ্ডিতকে শান্ত করিয়া আমলীতলায় তাঁহার সহিত বিশ্রাম ও আলাপ করিতে লাগিলেন।

তখন কি রকম লীলা হইয়াছিল, প্রাচীন বৈষ্ণব কবির পদে তাহা শ্রবণ করুন,—

“গৌরীদাস সঙ্গে, কৃষ্ণ কথা রঙ্গে,
বসিলা গৌর-হরি।
ভাবে হিয়া ভোর, ঘন দেয় কোর
দোহে গলা ধরাধরি॥
ভাব সম্বরিয়া, প্রভুরে বসাঞা,
গৌরীদাস গৃহ হৈতে।
চম্পকের মাল, আনিয়া তৎকাল,
গলে দিল আচম্বিতে॥

চম্পকের হার, চাহে বার বার,
আমার গৌররায়।
রাধার বরণ, হইল স্মরণ,
প্রেমধারা বহে গায়॥
প্রভু কহে বাস, শুন গৌরীদাস,
মনেতে পড়িল রাধা।
বাসু ঘোষে কয়, রাই রসময়,
দেখিতে হইল সাধা॥"

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ-লীলারস আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীগৌরীদাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে লইয়া গিয়া শ্রীগৌরীদাসের সহিত প্রভু কিছুদিন গুপ্ত-লীলা করেন।

সেই লীলারস প্রাচীন বৈষ্ণব পদে ভক্তগণ কিছু আস্বাদন করুন,—

"গৌরীদাস করি সঙ্গে, আনন্দিত তনু রঙ্গে,
চলি যায় গোরা গুণমণি।
ভাবে অঙ্গ থরথরি, দুনয়নে বহে বারি,
চাহে গৌরীদাসের মুখখানি॥
আচম্বিতে অচৈতন্য, প্রেমাবেশে শ্রীচৈতন্য,
পড়ি গেলা সুরধনী তীরে।
গৌরীদাস ধীরে ধীরে, ধরিয়া করিল ক্রোরে,
কোন দুখ কহত আমারে॥

কহিবার কথা নয়, কেমনে কহিব তায়,
মরি আমি বুক বিদরিয়া।
বাসু কহে আহা মরি, রাধা ভাবে গৌরহরি,
ধরিতে নারয়ে নিজ হিয়া॥"

"ভক্তিরত্নাকরে" লেখা আছে "অদ্ভুত-লীলা"; শ্রীগৌরীদাসের লীলা সত্যই অদ্ভুত। কারণ ইহা অতি অন্তরঙ্গ লীলা, সেই কারণ বহিরঙ্গের লীলার ন্যায় ইহা সমস্ত নরচক্ষুতে পরিস্ফুট হয় নাই। যে টুকু শুধু নরচক্ষুর জন্য করিয়াছিলেন,—সেই টুকুই অপরে জানিতে পারিয়াছেন। শ্রীগৌরীদাসের সহিত নবদ্বীপে কিছুদিন লীলা করিবার পর মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বহস্তলিখিত একখানি শ্রীগীতা দান করেন। পণ্ডিত ঠাকুর প্রভুর নিজ হস্তে লিখিত সেই শ্রীগীতাখানি অম্বিকায় লইয়া আইসেন এবং অহরহ সেই গীতা পাঠ করিতে থাকেন।

"পণ্ডিতে লইয়া প্রভু গেল নদীয়ায়।
করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায়॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত॥
কিছু দিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভুদত্ত গীতা পাঠ করেন সদায়॥"

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রদত্ত শ্রীগীতা ও শ্রীবৈঠা পাইয়া শ্রীগৌরীদাস যে জীব উদ্ধার করিবার উপযুক্ত কত বেশী শক্তি পাইয়া-

ছিলেন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ই তাহা তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আদি খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"গৌরীদাস পণ্ডিত, যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে, ধরে মহাশক্তি॥"

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাসের সম্মিলন স্থান, সেই আমলী বৃক্ষ এবং শ্রীগৌরীদাসের সেই প্রস্তর-নির্ম্মিত ভজন-সিংহাসন অদ্যাবধি অম্বিকায় বিরাজ করিতেছেন এবং প্রভুর শ্রীহস্ত লিখিত সেই শ্রীগীতা ও প্রভুদত্ত সেই শ্রীবৈঠার আজও শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস-শ্রীমন্দিরে সেবা-পূজা হইয়া আসিতেছে। বহু ভাগ্যবান্ ভক্ত তাহা নিজ চক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের ভাগ্যে এখনও দর্শন ঘটে নাই, তাঁহারা যেন অচিরে শ্রীপাট অম্বিকায় আসিয়া তাহা দর্শন করেন।

"প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি॥
প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিও অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে॥"

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীপাট-অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাসের সেই আমলী বৃক্ষই যে আজ শ্রীগৌর-গৌরীদাস-সম্মিলনের সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছেন, এই অদ্ভুত আমলী বৃক্ষ নিজেই তাহার প্রমাণ। এই বৃক্ষের কাণ্ড অর্দ্ধগোলাকার ভাবে খোলা। কাণ্ডের

(গুঁড়ির) সারাংশটি সম্পূর্ণ শুষ্ক ও নীরস। কেবলমাত্র কাঁচা ছাল সেই শুষ্ক, নীরস কাণ্ড অবলম্বন করিয়া মাটির সহিত সংযুক্তভাবে এই প্রকাণ্ড গাছকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই অৰ্দ্ধগোলাকার কাণ্ডের ভিতরাংশে শুষ্ক কাষ্ঠের উপর কিছু কাঁচা ছাল আসিয়া এক মনুষ্যমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে। এই মনুষ্যমূর্ত্তি এত সুস্পষ্ট যে, ইহা যে কোনও বালকেও বুঝিতে পারে। এই মূর্ত্তির দুইটী চরণ, কোমর, বক্ষ, বাহু, বগল, স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিলেই মনে হয় যেন একটি মনুষ্যমূর্ত্তি গাছের কাণ্ডে সংযুক্ত আছে। বহু ভক্ত এই শ্রীবৃক্ষ সংযুক্ত মনুষ্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। তবে অনেকে আবার না জানা হেতু শ্রীপাট দর্শনে আসিয়াও উহার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারেন; সেই জন্য সকলের জ্ঞাত কারণ ইহা উল্লেখ করিলাম। ইহা সকলেই জানেন যে ভগবৎলীলায় সবই সম্ভব এবং সেই লীলা হেতু এই শ্রীমূর্ত্তিরও প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগৌরীদাস এইরূপে অম্বিকায় শ্রীনিতাই-চৈতন্য ভজন ও প্রভুদত্ত গীতাপাঠজনিত বিপুল আনন্দরসে মগ্ন থাকিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যখন তিনি শুনিলেন, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহাকে শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে বহু কষ্টে লইয়া গিয়াছেন,—তখন তাঁহার সন্ন্যাসের উপর রাগ হইল। শচীমাতার কষ্ট,

শ্রীশ্রীগৌর-গৌরীদাস সম্মিলন-স্থানের

প্রাচীন তেঁতুল বৃক্ষের কাণ্ডে মনুষ্য মূর্ত্তি।

ক ও গ—চরণদ্বয়, গ—কটিদেশ, ঘ—দক্ষিণবাহু, চ—স্কন্ধ, ছ—বক্ষ, জ—মস্তক, ঝ—বটবৃক্ষের ন্যায় ঝুরি নামিয়াছে। তেঁতুল গাছে এইরূপ ঝুরি নামিতে দেখা যায় না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মান্তিক যাতনা, ভক্তবৃন্দের বিপুল আক্ষেপ,—কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, এই ভাবিয়া প্রভুর উপর তাঁহার অভিমান হইল। শ্রীভগবান্ সব সহ্য করিলেও, ভক্তের অভিমান সহিতে পারেন না। যেখানে ভক্ত শ্রীভগবানের উপর অভিমান করিয়াছেন, সেইখানেই শ্রীভগবানকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইয়াছে। অভিমানের জোরেই শ্রীল অদ্বৈত প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শান্তিপুরে টানিয়া আনিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুকে "কিলিয়ে" প্রেম দিয়াছিলেন, আর প্রভুর শ্রীহস্তের সেই "কিল" খাইয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেমলীলার সেই নৃত্য এত মধুর হইয়াছিল। বহু ভক্ত, বহু লোক এমন কি শ্রীশচীমাতা পর্য্যন্ত প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে গিয়াছিলেন, যান নাই কেবল আমাদের ভক্তপ্রবর শ্রীগৌরীদাস,। শ্রীগৌরীদাসের অভিমান তখন বড় ভীষণ হইয়াছে,—তিনি তখন কেবল ক্রন্দন করেন আর প্রভুর নাম লইয়া অভিমান ভরে তাঁহাকে দোষ দেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে প্রেমাভিমানী ভক্তের এই রকম এক একটি বাক্য শ্রীভগবানের নিকট বেদস্তুতি হইতেও মধুর।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন॥"

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তের এইরূপ অভিমানে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকায় আসিয়া শ্রীগৌরীদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নিজ প্রভুদ্বয়কে সম্মুখে দেখিয়া শ্রীগৌরীদাসের অভিমান কোথায় উড়িয়া গেল। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া প্রভুদের চরণে পড়িলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে অমনি বক্ষে ধরিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। তখন সকলেরই আনন্দ উথলিয়া উঠিল। পণ্ডিত বহু স্তুতি করিয়া প্রভুদের বলিতে লাগিলেন,—"তোমরা আমার বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। তোমরা সন্ন্যাস লইয়া নীলাচলে চলিয়া গেলে আমি আর কাহাকে লইয়া এবং কিসের জন্যই বা জীবনধারণ করিব? আমাকে এইরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা দিয়া দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া তোমরা চলিয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই আর প্রাণ রাখিব না।" তখন যে ঘটনা ঘটিল, প্রাচীন পদের প্রাণমাতান ভাষায় তাহা শ্রবণ করুন,—

"ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।

যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সবার হবে পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িও গৌরহরি,
তবে জানি পতিতপাবন ॥”

—গীত-কল্পতরু

পণ্ডিতের এইরূপ কাতরতা দর্শনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন। প্রভু তাঁহাকে তাঁহাদের মূর্ত্তি সেবা করিতে বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন,—“পণ্ডিত! আমি সন্ন্যাস লইয়া কাহারও বাড়ীতে চিরকাল কি করিয়া থাকিব? এ তোমার অতি অদ্ভূত কথা। তুমি আমার মূর্ত্তি সেবা কর।” ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আর কি করিতে হইল,—

“প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমন আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছি যে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
ফুকরি ফুকরি পুনঃ কান্দে।
পুনঃ সেই দুই ভাই, প্রবোধ করিল তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥

কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হইলা দুইজনে,
ভকতবৎসল তেঞি গায়॥”

এইরূপে প্রভু বহু রকমে পণ্ডিতকে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু পণ্ডিতের মন কিছুতেই শান্তি পাইল না। শ্রীগৌরীদাস যখন কোনও প্রকারেই মনকে সুস্থ করিতে পারিলেন না, তখন প্রভুকে উপায় স্থির করিয়া স্পষ্ট বলিতে হইল,—

“পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি।
একদিন পণ্ডিতেরে কহয়ে যত্ন করি॥
নবদ্বীপ হইতে নিম্ব বৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্ম্মাণ করাইবে॥
অনায়াসে নির্ম্মাণ হইব মূর্ত্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়॥”

—ভক্তিরত্নাকর

এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতের আর আনন্দ ধরে না। নবদ্বীপে যে নিম্ববৃক্ষের তলায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীনিমাই, শ্রীগৌরীদাস অতি তৎপর সেই নিম্ববৃক্ষ আনাইয়া প্রভুদের মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন। কে যে এই মূর্ত্তি প্রস্তুত

করিলেন, “ভক্তিরত্নাকর” গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। কেবল মাত্র এই কথা আছে,—

“যে নির্ম্মাণ করিল সে প্রভুর কৃপা-পাত্র।
আপনি প্রকটয়ে অন্যের ছল মাত্র ॥”

শ্রীগৌরীদাসের প্রভুদ্বয়ের এই শ্রীমূর্ত্তি, প্রভু যে নিজে প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি। তবে “শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ” গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয়, শ্রীগৌরীদাস নিজেই ভাস্কররূপে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন।

“শ্রীমান্ গৌরীদাস শিল্প কার্য্যে পটুতর।
ঐছে শিল্প নাহি জানি ভুবন ভিতর ॥”
—অদ্বৈত-প্রকাশ

উক্ত গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে, শ্রীল অদ্বৈত প্রভু স্বয়ং এই শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা কার্য্যাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে অদ্যাপিও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য প্রভুদ্বয়ের জন্মতিথি মহোৎসবে শ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে প্রভুদ্বয়ের অভিষেক কার্য্যাদি আচার্য্য শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর বংশধরের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর শ্রীঈশাননাগর নামে জনৈক শিষ্য গুরু-সন্নিধানে থাকিয়া সদা সর্ব্বদা গুরুসেবায় কালাতিপাত করিতেন। এই শ্রীঈশান-নাগর প্রাচীন বয়সে ১৪৯০ শকাব্দে এই “শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ” গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এই শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় নির্ম্মিত হইলে, তাঁহাদের শ্রীরূপ দেখিয় শ্রীগৌরীদাসের আনন্দ আর ধরে না। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার নয়ন হইতে ক্রমাগত বারিধারা ঝরিতে লাগিল। শুভক্ষণে শুভদিন শাস্ত্রমতে অভিষেক করাইয়া শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়কে সিংহাসনে বসাইলেন। অভিষেক-কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পরই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্যপ্রভু দুইজনে শ্রীগৌরীদাসের নিকট বিদায় লইয়া রওনা হইলেন। প্রভুদ্বয়ের যাত্রার অব্যবহিত পরেই শ্রীগৌরীদাস সিংহাসনস্থিত বিগ্রহদ্বয়ের সহিত কথা কহিতে গেলেন; কিন্তু শ্রীবিগ্রহদ্বয় তাঁহার সহিত কথা কহিলেন না। তখন পণ্ডিতের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যে বিগ্রহ কথা কহিবে না, সে বিগ্রহ লইয়া পণ্ডিতের কি হইবে? প্রভুরা তখনও গঙ্গা পার হয়েন নাই। পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ শ্রীনিতাইচৈতন্য দুই ভাইকে ডাকিতে পাঠাইলেন। অন্তর্যামি প্রভুরা তখনই পণ্ডিতের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কি পণ্ডিত! আবার খবর কি?"

শ্রীগৌরীদাস তখন বলিলেন,—"আমি এই বিগ্রহ চাহি না। ইহারা আমার সঙ্গে কথা কহিল না, ঐরূপ বিগ্রহ লইয়া আমি কি করিব? প্রভু তোমরা দুইজনে থাক ত থাক।"

প্রভুরা বলিলেন,—"আমরা থাকিলে হইবে? আচ্ছা আমরাই রহিলাম।" এই কথা বলিবামাত্র প্রভুরা

শ্রীমন্দিরের বাহিরে দারুময় মূর্ত্তি হইয়া নিথর নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর,—হরি হরি বল,—সিংহাসনের শ্রীবিগ্রহদ্বয় স্বয়ং পায়ে হাঁটিয়া শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গৌরীদাস দেখিলেন ইহাও ত আবার বিপদ কম নহে। তখন তিনি সিংহাসন হইতে যে মূর্ত্তিদ্বয় বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের বলিলেন,—"তোমরা থাক।" এইরূপে দুই চারিবার পরিবর্ত্তনের পর যখন পণ্ডিত দেখিলেন যে, তিনি যে মূর্ত্তিদ্বয়কে রাখিতে চাহিতেছেন, তাহারাই দারুময় হইয়া যাইতেছেন, তখন তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া প্রভুদের চরণে পড়িতে গেলেন। প্রভুরাও তাঁহাকে আবার বক্ষে ধরিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন,—"পণ্ডিত! তুমি এখন নিজে ত দেখিলে, আমরাও যে, তোমার দারু-বিগ্রহও সেই। এখন তুমি নিজেই বলিতে পারিবে না, কোন দুই মূর্ত্তি আমরা এবং কোন দুই মূর্ত্তিই বা তোমার দারু-বিগ্রহ। অতএব আজ আমরা নিজ মুখে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, তুমি যতদিন নশ্বর দেহ লইয়া বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমরা চাক্ষুষভাবে তোমার সহিত লীলা করিব; কলিযুগে চিরকাল মধ্যাহ্নে তোমার এখানে খাইব; তোমার এখান হইতে কখনও আমরা যাইব না। যদি কোনও ভক্ত একাগ্রভাবে ক্রমান্বয়ে পাঁচ দণ্ড কাল আমাদের দর্শন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া লইয়া যান, তবেই আমরা যাইব। অতএব পণ্ডিত, স্থির হও।"

"পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই তুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তব ঠাঁই খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥

—গীত-কল্পতরু

প্রভুদের নিজমুখের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া শ্রীগৌরীদাস তখন আশ্বস্ত হইলেন। পণ্ডিতের প্রাণের ইচ্ছা তখন পূর্ণ হইল। পণ্ডিত তখন বহুপ্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া এই অভেদ চারি মূর্ত্তিকে (অর্থাৎ দুই মূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দ ও দুই মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ) ভোজন করাইলেন। দুই মূর্ত্তি শ্রীগৌরীদাসের শ্রীমন্দিরে চিরকালের জন্য বাঁধা রহিলেন এবং দুই মূর্ত্তি নীলাচলে গমন করিলেন।

"শুনিয়া পণ্ডিত রাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারিজনে ভোজন করাইয়া।
পুষ্পমাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে গন্ধ লেপিয়া॥
নানা মতে পরতীত, করিয়া ফিরিল চিত,
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি,
দুই গেলা নীলাচল পুরে॥"

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের সেই স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস মন্দিরে অদ্যাপিও পণ্ডিত ঠাকুরের রীতিতে সেবা পূজা হইয়া আসিতেছে।

তৎকালীন্ পরম বৈষ্ণবের প্রাচীন পদেই বলি,—

"দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে।
গৌরীদাস মন্দিরে প্রভু অম্বিকাতে বিহরে॥
তপ্ত হেম অঙ্গ কান্তি প্রাতঃ অরুণ অম্বরে।
আনন্দ স্কন্দ নিত্যানন্দ সঙ্গে সঙ্গে বিহরে॥
পাষণ্ড দণ্ড খর্ব্ব হেতু ধর্ম্ম দণ্ড বিচরে।
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্ব জীব উদ্ধারে॥"

শ্রীগৌরীদাস শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুদ্বয়ের দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। ভক্তে দর্শন চাহিলেই দর্শন দেওয়া হয়; দর্শন দেওয়ার অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে অনেক ভক্তই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, বেশীক্ষণ ধরিয়া দর্শন দেওয়া হয় না কেন এবং অন্যান্য শ্রীবিগ্রহগণের দরজা সর্ব্বদা খোলা রহিয়াছে কিন্তু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দরজাই বা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে কেন? এই সূত্রে ইহা এখানে উল্লেখ করি যে, নীলাচলে যখন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন তখন একমাত্র এই শ্রীগৌরীদাস-শ্রীমন্দিরে ভিন্ন অপর কোথাও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ছিলেন না। ভক্তগণ আকুল আগ্রহে অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে প্রভু দর্শনের জন্য

আসিতে লাগিলেন। পাছে কোনও ভক্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রভুকে লইয়া যান, এই ভয়ে শ্রীগৌরীদাস আর দর্শন দিতে রাজি হইলেন না। ভক্তগণ শ্রীশচীমাতার নিকট শ্রীগৌরীদাসের কার্য্যের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। শ্রীশচী-মাতা শ্রীগৌরীদাসকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ মত সময়টুকু সম্পূর্ণ দর্শন করিতে না দিয়া অল্প কিছুক্ষণের জন্য দর্শন দিলে আর কি ভয় থাকিতে পারে? শ্রীগৌরীদাস আর তখন কি করেন,—সেইরূপে দর্শন দিবারই ব্যবস্থা করিলেন। ভক্তগণও প্রভু-দর্শন পাইয়া প্রাণে বাঁচিলেন। সেই সময় হইতে এইরূপ "ঝাঁকি" দর্শনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া আছে।

এইরূপে শ্রীনিতাই-চৈতন্যদেবকে নিজ ঘরে বাঁধিয়া রাখিয়া শ্রীগৌরীদাস অনন্ত সুখে মগ্ন রহিলেন। প্রভু যে কত নিত্য নূতন লীলা শ্রীগৌরীদাসের সহিত খেলিতে লাগিলেন—তাহা এক শ্রীগৌরীদাসই জানেন।

"নিতাই চৈতন্য গৌরীদাস প্রেমাধীন।
জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রি দিন॥
নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের গৃহেতে।
যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে॥
কহিতে না জানি পণ্ডিতের অভিপ্রায়।
নিরন্তর মগ্ন দুই প্রভুর সেবায়॥"

—ভক্তিরত্নাকর

একদিন প্রভু শ্রীগৌরীদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত! তুমি প্রেমানন্দে এত ডুবিয়া আছ যে তোমার পূর্ব্ব কথা মনে নাই। ওহে পণ্ডিত! তুমিই ত আমার ব্রজের সেই সুবল। যমুনা-পুলিনে কি বেশে এবং কত সুখেই যে আমরা গরু চরাইতাম, তাহা তুমি কি ভুলিয়া গেলে?" এই কথা বলিয়া প্রভু নিজে তখনই "রাখাল বেশ" পণ্ডিতকে দেখাইলেন। আহা-মরি! মরি! কি সে! চরণে নূপুর, পরণে পীতধড়া, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে বেণু, এবং অধরে প্রাণমাতান হাসি! ভুবন-ভোলান সে রূপ, পণ্ডিত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু সে রূপ সম্বরণ করিলে, পণ্ডিত কিছু স্থির হইলেন এবং সিংহাসনে নিজ প্রভুকে আবার দেখিতে পাইলেন।

একদিন পণ্ডিত রন্ধন করিয়া দুই ভাইকে খাইতে দিলেন। দুই ভাই না খাইয়া চুপ করিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতের রাগ হইল। পণ্ডিত বলিলেন যে, যদি উপবাস করিয়া থাকিতে সুখ হয় তবে তাঁহাকে বৃথা রন্ধন করাইয়া ফল কি? পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, প্রভুরা যদি না খাইলেন তবে তিনিও না খাইয়া মরিবেন।

"দেখিয়া প্রভুর ভঙ্গী পণ্ডিত ঠাকুর।
কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর॥
বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে॥"

—ভক্তিরত্নাকর

পণ্ডিত না খাইয়া প্রাণ দিবেন, আর কি দয়াল ঠাকুর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন ? তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত ! তুমি আমাদের জন্য অল্পসল্প কিছু রন্ধন করিবে। আমরা তাহাতেই তৃপ্ত হইব।" শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তখন বলিলেন যে, বেশ, আর তত প্রকার তিনি রন্ধন করিবেন না। এক শাক আর অন্ন দিবেন। পরদিন পণ্ডিত এক শাক হইতেই বহু প্রকার তরকারি রন্ধন করিলেন। তাহা দেখিয়া প্রভুরা বলিলেন,—"পণ্ডিত ! এই কি তোমার এক শাক ? তোমার শ্রম দেখিয়া আমাদের কষ্ট হয়। সেই জন্য তোমাকে অল্প কিছু রন্ধন করিতে বলিয়াছিলাম। আজ দেখিলাম তোমাকে সে কথা বলা বৃথা। বেশ, আজ হইতে তোমাকে "আপ্তমতে" সেবাধিকার দিলাম।"

"পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ,
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥"

সেই দিন পণ্ডিতের রাঁধা শাক খাইয়া প্রভুরা অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, এইরূপ শাক তাঁহারা কখনও ভোজন করেন নাই। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য প্রভুদের মধ্যাহ্ন অন্নভোগের সহিত কোনও না কোন প্রকার শাক দিতেই হইবে—এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

এইরূপে কিছুকাল শ্রীগৌর-লীলারস উপভোগ করিবার পর শ্রীগৌরীদাস একদিন প্রভুপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। প্রাতঃকালে শ্রীগৌরীদাসকে দর্শন করিয় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়ৎকাল শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আলোচনা করিবার পর শ্রীগদাধর প্রভু পণ্ডিতের আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীগৌরীদাস বলিলেন যে, প্রাচীন বয়সে প্রভুদের সেবা করিবার জন্য একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হওয়ায় তিনি তাঁহার আত্মীয় হৃদয়কে (শ্রীগদাধর প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র) ভিক্ষা লইতে আসিয়াছেন। প্রভু গদাধর সমস্তই বুঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হৃদয়ানন্দকে ডাকিয়া শ্রীগৌরীদাসের হাতে সমর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরীদাস আনন্দচিত্তে হৃদয়ানন্দকে অম্বিকায় লইয়া আসিয়া বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্ত্রশিক্ষা দিলেন। ভক্তিরস হইতেই হৃদয়ানন্দের উৎপত্তি; সুতরাং তাঁহার হৃদয়েও প্রেমভক্তি অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে যখন হৃদয়ানন্দ উপযুক্ত হইলেন, তখন শ্রীগৌরীদাস তাঁহাকে স্বয়ং দীক্ষামন্ত্র দিয়া তাঁহার প্রাণস্বরূপ শ্রীনিতাইচৈতন্য-সেবায় নিযুক্ত করিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দও শ্রীনিতাইচৈতন্য সেবাকে নিজের হৃদয়ের মত জ্ঞান করিয়া তাহাতে কায়মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীগৌরীদাস শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের সেবা উপযুক্ত পাত্রেই

পড়িবে। তখন তিনি আরও নিশ্চিন্ত মনে ভজন সাধনে মন দিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীগৌরীদাসের একদিন ইচ্ছা হইল যে হৃদয়ানন্দকে কিছু পরীক্ষা করেন। তিনি হৃদয়ানন্দকে বলিলেন যে, প্রভুর মহোৎসব আসিয়া পড়িল ; অতএব তিনি মহোৎসবের দ্রব্য আনিতে শিষ্যগণের বাড়ীতে গমন করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে হৃদয়ানন্দ যেন বেশ সাবধানে থাকেন। এই বলিয়া শ্রীগৌরীদাস শিষ্যবাড়ী ভ্রমণে বাহির হইয়া ভক্তগণ সঙ্গে গৌরপ্রেমানন্দে বেশ দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে মহোৎসবের দিন প্রায় সমাগত ; আর মাত্র দুই দিন বাকী আছে। তখন হৃদয়ানন্দ চিন্তিত হইলেন। গুরুদেব তখনও ফিরিলেন না, অথচ নিমন্ত্রণ-পত্র না পাঠাইলে আর চলে না। গুরুদেব হয়ত মহোৎসবের পূর্ব্বদিনেও ফিরিতে পারেন ; কিন্তু তখন আর পত্র পাঠাইবার সময় কোথায় ? এইরূপ চিন্তার পর হৃদয়ানন্দ শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিয়া যথাযথ স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। শ্রীগৌরীদাসও মহোৎসবের ঠিক পূর্ব্বদিনেই ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিলেন যে হৃদয়ানন্দ নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছেন, তখন তিনি বাহ্যিক ক্রোধে যেন অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। কি, এত বড় কথা ? তিনি প্রকট থাকিতেই হৃদয়ানন্দের স্বতন্ত্র ব্যবহার ? হৃদয়ানন্দকে বাড়ী হইতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে তিনি আদেশ করিলেন।

হৃদয়ানন্দ আর কি করিবেন,—শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং গঙ্গাতীরে বসিয়া রাত্র কাটাইলেন। পরদিন প্রাতে অতি দুঃখিত মনে তিনি গঙ্গার তীরে বসিয়া আছেন—সেইদিন মহোৎসব; অথচ তিনি মহোৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন না। তিনি শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিতেছেন; আর তাঁহার নয়নে অজস্রধারায় বারি ঝরিতেছে। এমন সময় মহোৎসবের জন্য এক নৌকা দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া এক শিষ্য আসিয়া সেই ঘাটে উপস্থিত হইল। লোক দ্বারা হৃদয়ানন্দ শ্রীগুরুদেবকে নৌকাপূর্ণ দ্রব্য-সম্ভারের খবর দিলেন। শ্রীগৌরীদাস ক্রোধবশে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ঐ দ্রব্য যখন হৃদয়ানন্দের সম্মুখে পড়িয়াছে, তখন তিনি আর উহা গ্রহণ করিবেন না। হৃদয়ানন্দ যদি পারে ত নিজে ঐ দ্রব্য লইয়া উৎসব করুক। ইহা শুনিয়া হৃদয়ানন্দের আনন্দ আর ধরে না। শ্রীগুরুদেব উৎসব করিতে আদেশ দিয়াছেন—এত বড় আনন্দের কথা! গঙ্গার ধারে হৃদয়ানন্দ ঠাকুর উৎসব করিবেন, খবর পাইয়া বহু বৈষ্ণব খোল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সে কীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনি ভাগীরথী-তীরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত অম্বিকাকে মুখরিত করিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কীর্ত্তন মাঝে স্বয়ং অবতীর্ণ না হইলে কীর্ত্তনের এরূপ প্রাণস্পর্শী ধ্বনি কখনও উঠিতে পারে না। শ্রীকীর্ত্তনের এই মধুর ধ্বনি শুনিয়া শ্রীগৌরীদাসের প্রাণে যুগপৎ আনন্দ ও ভীতির সঞ্চার হইল।

তিনি বুঝিলেন যে, শ্রীচৈতন্যের বিনা উপস্থিতে এরূপ কীর্ত্তন কখনও সম্ভবপর নহে। তিনি যে ভয়ে তাঁহার শ্রীমন্দিরে দেখিতে গেলেন,—হইলও তাঁহার ঠিক্ সেইরূপ্। শ্রীমন্দিরের ভিতর যাইয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কি হইল,—সিংহাসনে প্রভুরা নাই। শ্রীগৌরীদাস তখন স্থির বুঝিলেন,—আর কোথাও নহে, প্রভুরা হৃদয়ানন্দের উৎসব-কীর্ত্তনে নিশ্চয় নৃত্য করিতে গিয়াছেন। শ্রীগৌরীদাস তখন ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া হাতে এক লাঠি লইয়া হৃদয়ানন্দের কীর্ত্তনে চলিলেন। পণ্ডিত দূর হইতে দেখিলেন,—ঠিক তাই. শ্রীনিতাইগৌর দুই ভাই হৃদয়ানন্দের সহিত কীর্ত্তন মাঝে নৃত্য করিতেছেন আর বৈষ্ণবগণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কীর্ত্তন-ধ্বনি তুলিতেছেন। শ্রীনিতাইগৌর দুই ভাই দূরে পণ্ডিতকে ছড়ি হাতে আসিতে দেখিয়া যেন ভয়ে "ভাল ছেলেটি"র মত গৌরদাস-মন্দিরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন—আর শ্রীগৌরীদাস কি দেখিলেন—দেখিলেন যে শ্রীনিতাইগৌর দুই ভাই শ্রীহৃদয়ানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতের হাতের ছড়ি পড়িয়া গেল,—আনন্দধারায় বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল,—তিনি দৌড়াইয়া গিয়া হৃদয়ানন্দকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন,—আর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ওরে, হৃদয় রে! আজ হ'তে তোর নাম হ'ল হৃদয়চৈতন্য। তুই আমার শ্রীচৈতন্যের উপযুক্ত সেবক। চল তুই বাড়ী ফিরে চল।" শ্রীহৃদয়চৈতন্যও শ্রীপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িলেন। দুইজনে

শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। কি আনন্দ—সে আনন্দ আর ধরে না। সেইদিন শ্রীগৌরীদাস শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য-সেবার অধিকারী করিলেন।

এইরূপে শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে প্রাণের ঠাকুর শ্রীনিতাই-চৈতন্যের শ্রীসেবাধিকার দান করিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর কিছুকাল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-প্রেম-ভজনা করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রায় বসিলে ১৪৮১ শকাব্দে সেই শ্রাবণ-শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে ৺বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের নিজস্ব "ধীরসমীর কুঞ্জে" শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নশ্বর দেহকে সমাহিত করা হয়। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের এই সমাধি দর্শনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গিনী ঈশ্বরী জাহ্নাবা মাতা বহুক্ষণ ধরিয়া নয়ন জলে ভাসিয়াছিলেন। তখন শ্রীধাম-বৃন্দাবনের এই ধীরসমীর কুঞ্জে বড়ু (অর্থাৎ বড়) গঙ্গাদাস নামে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের অপর এক শিষ্য পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীশ্রী৺শ্যামরায় বিগ্রহ ও তাঁহার সমাজের সেবা করিতেন। এই বড়ু গঙ্গাদাসকে ঈশ্বরী জাহ্নবা মাতা বহু কৃপা করিয়াছিলেন।

"হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যাইবেন শ্রীগৌরমণ্ডলে শীঘ্র করি॥
যথা যে বৈষ্ণবগণ ছিলেন নির্জ্জনে।
সকলেই শীঘ্র পাইলেন বৃন্দাবনে॥

গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে।
বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে॥
না জানিয়ে তথা কি দেখিয়া চমৎকার।
বড়ু গঙ্গাদাসে কি কহিল বার বার॥
স্থির হইলা বড়ু গঙ্গাদাসের কথায়।
তাঁর পরিচয় কিছু নিবেদি এথায়॥
ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্য্যদাসের ঘরণী॥
যাঁর ভক্তি-রীত দেখি সবার বিস্ময়।
গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর তনয়॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রেমময়।
পণ্ডিতের অদর্শনে জীবন সংশয়॥
স্বপ্নচ্ছলে যৈছে আজ্ঞা করিলা পণ্ডিত।
তৈছে শীঘ্র বৃন্দাবনে হৈল উপনীত॥
শ্রীধীর সমীরে নিজ প্রভু সন্নিধানে।
করহে প্রভুর সেবা রহয়ে নির্জ্জনে॥"

—ভক্তিরত্নাকর।

শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের সেবাইতগণই শ্রীধাম বৃন্দাবনের এই "ধীর-সমীর কুঞ্জের" বর্ত্তমান মালিক ও সেবাইত হইতেছেন। বর্ত্তমানে উক্ত "ধীর সমীর কুঞ্জের" সেবাইত-গণের জনৈক আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী পরম

বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত জহরলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেবাইতগণের পক্ষ হইতে অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়করূপে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত "কুঞ্জে" বাস করিতেছেন। তিনি ভক্তগণের সাহায্যে উক্ত "কুঞ্জের" যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এজন্য উক্ত কুঞ্জের বর্ত্তমান মালিক ও সেবাইতগণের পক্ষ হইতে তিনি ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

পরম বৈষ্ণবগণ ! পরম ভাগবতগণ ! শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের এই সমাধিস্থান আপনাদের সকলেরই জ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সকলের সব জিনিষ জ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ইহা উল্লেখ করিলাম। আপনারা যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইবেন, তখন পণ্ডিত ঠাকুরকে একবার শ্রীকৃষ্ণ-নাম শ্রবণ করাইয়া প্রেমধারায় তাঁহার সমাধি সিক্ত করিয়া আসিবেন—তাহাতে তাঁহার কৃপা পাইবেন।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীগৌরীদাসের প্রাণের ঠাকুর-সেবা মন-প্রাণ দিয়া করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন "দুঃখী" নামে জনৈক ভক্ত তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য শ্রীপাট অম্বিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে এই "দুঃখী"ই শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নামে বৈষ্ণব মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত।

"দুঃখী"র পৈত্রিক আদি নিবাস "ধারেন্দা বাহাদুরপুর" গ্রামে। পরে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ দণ্ডেশ্বর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীমতী দুরিকা, জাতি সদ্গোপ। তাঁহারা পরম কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের কয়েকটি পুত্রকন্যা মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে "দুঃখী" জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে ঐ পুত্রটিকে রক্ষা করেন, এই ভরসায় তাঁহারা পুত্রের নাম রাখিলেন "দুঃখী"। "দুঃখী" বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী এবং অত্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। অল্প বয়সেই ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপন করিয়া রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত পান করিতে লাগিলেন ও অতি সাবধানে পিতামাতার সেবা করিতে লাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা দুঃখীকে যেখানে ইচ্ছা সদ্গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা লইতে আদেশ দিলেন। শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের

নিকট দীক্ষা লইবার ইচ্ছা তিনি পিতামাতাকে জ্ঞাপন করেন। তিনি পিতামাতার নিকট অনুমতি ও বিদায় লইয়া শুভ ফাল্গুন মাসে শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে অম্বিকা নগরে আসিলেন। দুঃখীকে দেখিয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্যের কৃপা হইল। তিনি দুঃখীর নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। এত অল্প বয়সে এরূপ কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইল। শুভ ফাল্গুনি-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য দুঃখীকে দীক্ষা দিয়া "দুঃখী কৃষ্ণদাস" নাম রাখিলেন এবং তাঁহার "শ্যামানন্দ" নাম যে শ্রীবৃন্দাবনে হইবে তাহারও ইঙ্গিত দিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস কিছুকাল শ্রীগুরুর সেবা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীগুরুদেব দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইতে আদেশ দিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস কিন্তু শ্রীগুরুদেবকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু কি করেন, শ্রীগুরুর আজ্ঞায় তাঁহাকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাইতে হইল। দুঃখী কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবগণ বিমোহিত হইলেন। শ্রীপাট অম্বিকা হইতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য পত্রদ্বারা শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়কে লিখিলেন যে, তাঁহার প্রাণপ্রিয় শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিলেন; যাহাতে দুঃখী কৃষ্ণদাসের মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাহা যেন তিনি কৃপা করিয়া করেন। আর শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসকে লিখিলেন যে, শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়কে যেন ঠিক গুরুর ন্যায় দেখেন এবং পরম ভক্তি করেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রথমে রাধাকুণ্ড তীরে গেলেন। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া তাঁহার নয়ন হইতে ক্রমাগত বারিধারা ঝরিতে লাগিল। ব্রজবাসিগণ দুঃখী কৃষ্ণদাসের অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি দর্শনে তাঁহাকে শ্রীদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। শ্রীদাস গোস্বামী দুঃখী কৃষ্ণদাসের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া নিজ লোক সঙ্গে দিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীজীব গোস্বামীও তাঁহার মুখে সমস্ত সংবাদ লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে তাঁহার গ্রন্থ আস্বাদন হইবে?" শ্রীজীব গোস্বামী বলিলেন, "শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ হইতে পারিবে।" সেই সময় শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তম তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীজীব গোস্বামী দুঃখী কৃষ্ণদাসের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাস তিন জনে পরম প্রীতিতে কিছু-কাল যাবৎ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাসের উপর শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের কৃপা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় দুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম রাখিলেন "শ্যামানন্দ" এবং তাঁহাকে মানস-সেবার অধিকারী করিলেন। সেই হইতে শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম হইল "শ্যামানন্দ"। ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া কিছুকাল পরে শ্রীশ্যামানন্দ গুরুপাট শ্রীঅম্বিকায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীশ্যামানন্দের "তিলক" কিরূপ অলৌকিক শক্তিবলে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার এক অতি আশ্চর্য্যজনক লীলা-বিবরণ আছে। শ্রীশ্যামানন্দ একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীনিকুঞ্জবনে একখানি সোণার নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ঠাকুরের সেবাইত, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলে যখন সেই সোণার নূপুরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্যামানন্দ বলিলেন যে, তিনি একটি সোণার নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছেন। শ্রীশ্যামানন্দ তখন সেই সোণার নূপুর নিজের নিকট হইতে বাহির করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, সেই নূপুর কাহার। যখন তিনি শুনিলেন যে, উহা শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণের নূপুর, তখন তিনি উহা নিজ কপালে স্পর্শ করাইলেন। কপালে সেই নূপুর স্পর্শ করাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দের কপালে নূপুরের স্পষ্ট চিহ্ন চিরস্থায়ীভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। নাসিকা হইতে কপাল পর্য্যন্ত যখন নূপুরের চিহ্ন চিরস্থায়ীভাবে অঙ্কিত রহিল, তখন শ্রীশ্যামানন্দ অপর রকম "তিলক" আর কি করিবেন? সেই নূপুরের দাগে দাগে তিনি "তিলক" করিতে লাগিলেন। গুরুদেব শ্রীহৃদয়চৈতন্য যখন শুনিলেন যে, শ্রীশ্যামানন্দ "তিলক" পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন অন্তর্যামি ভাবে সমস্ত বুঝিয়াও প্রিয় শিষ্যের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য বাহ্য ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দের সহিত শ্রীধাম বৃন্দাবনে

দেখা করিলেন এবং ভীষণ ক্রোধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ তিলক তোকে কে দিয়াছে ?" শ্রীশ্যামানন্দ অতি বিনীতভাবে শ্রীগুরুর চরণে পড়িয়া বলিলেন,—"এ তিলক, প্রভু, আপনি আমাকে দিয়াছেন। আপনি আমার শ্রীগুরুদেব ; আপনি আমাকে কৃপা করিয়া না দিলে, অন্য কাহার ক্ষমতা ইহা আমাকে দেয়। ইহা আপনিই আমাকে দিয়াছেন।" গুরুদেব শ্রীহৃদয়চৈতন্য যতবার জিজ্ঞাসা করেন, —"এ তিলক তোকে কে দিয়াছে ?" শ্রীশ্যামানন্দ ততবারই বিনীতভাবে ঐ একই উত্তর দেন,—"এ তিলক, প্রভু, আপনি আমাকে দিয়াছেন।" তখন লোক চক্ষুতে প্রিয় শিষ্যের গুণ ও শক্তি প্রকাশ করিবার জন্য বহু ব্রজবাসী পরম বৈষ্ণবগণের সম্মুখে শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীশ্যামানন্দের কপালের সেই নূপুরের দাগ তীক্ষ্ণ ছুরির দ্বারা পাঁচ দিন ধরিয়া চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধারাণীর কৃপায় শ্রীশ্যামানন্দের কপাল হইতে না পড়িল একটু রক্ত আর না উঠিল সেই নূপুরের দাগ। ইহা দেখিয়া চারিদিক হইতে বৈষ্ণবগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। তখন প্রিয় শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দকে বুকে জড়াইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রেমাশ্রুধারা ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন,—"বাপ দুঃখী কৃষ্ণদাস! ওরে আমার শ্যামানন্দ! আজ হইতে তোর এইরূপ "তিলক"ই আমি দিলাম।" আর শ্রীশ্যামানন্দও শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। সেই হইতে শ্রীশ্যামানন্দের ঐরূপ "নূপুরে

তিলক" হইল। বলি হারি গৌরীদাস! যেমন হৃদয়চৈতন্যের ন্যায় শিষ্য তোমার, তেমনই শ্যামানন্দের ন্যায় শিষ্য আজ হৃদয়চৈতন্য পাইল।

সেই জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিথি মহোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্ব পাঁচ দিন এই দণ্ড মহোৎসবরূপে আজও নিরূপিত হইয়া আছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থপাঠ সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীপাট অম্বিকায় ফিরিয়া আসিলে শ্রীচৈতন্যের কৃপাবলে শ্রীহৃদয়চৈতন্য শ্রীশ্যামানন্দের মধ্যে পূর্ণশক্তি সঞ্চার করিলেন। গুরুশক্তি-সঞ্চারিত দেহে শ্রীশ্যামানন্দ আর পূর্ব্বের "শ্যামানন্দ" রহিলেন না। যখন তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণ হইয়া অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইল, তখন গুরুদেব শ্রীহৃদয়চৈতন্য গৌরপ্রেম প্রচার দ্বারা জীব উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে উৎকল দেশে প্রেরণ করেন। গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরিয়া শ্রীশ্যামানন্দ উৎকলে গেলেন। শ্রীগুরুর কৃপায় তিনি অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনে ঐ অঞ্চল গৌরপ্রেমে প্লাবিত করিয়া মহা মহা পাপীকে পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্রীপাট অম্বিকা হইতে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ সহ যাত্রা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রথমে নিজ জন্মভূমি দণ্ডেশ্বর ধারেন্দা গ্রামে প্রেমভক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহার পর মল্লভূমি মধ্যে রয়নী, বারায়িত প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর স্থানে কিছুকাল ভ্রমণ করিলেন। রয়নীর রাজা শ্রীঅচ্যুতের শ্রীরসিকানন্দ

শ্রীমুরারি নামে এক পুত্র ছিলেন। সাধারণতঃ শ্রীরসিকমুরারি নামে তিনি পরিচিত। শ্রীরসিক মুরারির মাতার নাম শ্রীমতী ভবানী। রসিকমুরারি বাল্যকালেই সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। রসিকমুরারি তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছা হেতু সুবর্ণরেখা নদীতীরে ঘণ্টশীলা (ঘাটশীলা) গ্রামে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় একদিন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কাহার নিকট দীক্ষিত হইবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তিনি আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন,—"শ্রীশ্যামানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর।" তিনি অজ্ঞাত, অপরিচিত শ্রীগুরুর নাম "শ্রীশ্যামানন্দ মন্ত্র" জপ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ গুরু দর্শনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে তিনি রাত্রে শয়ন করিলে, শ্রীশ্যামানন্দ স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—"কল্য প্রাতে আমার দেখা পাইবে।" রসিক মুরারি শ্রীগুরুর হাস্যপ্রফুল্লিত শ্রীবদন দর্শন করিয়া প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেবল পথ পানে ঘন ঘন চাহিতে লাগিলেন। কিশোরদাস প্রভৃতি ভক্তগণ পরিবৃত, তেজপূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময়, শ্রীনিতাইচৈতন্য প্রেমে বিহ্বল শ্রীশ্যামানন্দকে রসিকমুরারি দূর হইতে দর্শন করিলেন। গুরুদেব শ্রীশ্যামানন্দকে দর্শন করিয়া রসিকমুরারি তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ কৃপা করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র দান করিলেন। রসিকমুরারি শ্রীগুরু-

দেবকে নিজ বাসস্থল রয়নীতে লইয়া গিয়া মহোৎসব করিলেন। কিছুকাল রয়নীতে থাকিয়া শ্রীশ্যামানন্দ বহু লোককে প্রেমভক্তি দ্বারা দীক্ষিত করিলেন। শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত শ্রীশ্যামানন্দ জীব উদ্ধারের জন্য রয়নীগ্রাম হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীদামোদর নামে একজন যোগাভ্যাসী ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ কৃপা করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম দ্বারা দামোদরকে শিষ্য করিলেন। শ্রীদামোদর তাঁহার শিষ্য হইয়া "নিতাইচৈতন্য" বলিয়া প্রেমধারা ফেলিতে লাগিলেন।

এইরূপে বলরামপুরে আসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রেমভক্তি প্রকাশ দ্বারা বহু শিষ্য করিলেন। শিষ্যগণসহ পুনরায় ধারেণ্ডা গ্রামে আসিয়া মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। সেখানে বহুলোক তাঁহার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সকলেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক উদ্ধার হইলেন। শ্রীনৃসিংহপুরেও ঐরূপ প্রেমভক্তি প্রকাশ করিলেন। পরে শ্রীপাট গোপীবল্লভ-পুরে আসিয়া প্রেমবৃষ্টি দ্বারা বহু লোককে শিষ্য করিলেন এবং সেইখানে শ্রীগোবিন্দজিউর সেবা প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্যাম-নন্দ প্রভু নিজ শিষ্য শ্রীরসিকানন্দকে ঐ সেবার অধিকারী করিলেন।

আজও শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রকাশিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউর সেবা তাঁহার শিষ্যবংশ প্রেম-চঞ্চলিত চিত্তে করিয়া আসিতেছেন। আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উক্ত শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের সেবাইত (তাঁহার নাম

আমার ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ গোস্বামী) শ্রীপাট অম্বিকায় তাঁহাদের পরমগুরুর পাট দর্শনে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অলৌকিক প্রেমশক্তি প্রকাশ ও কার্য্যাবলী "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিত" গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত থাকায় আমি এখানে অতি প্রাচীন গ্রন্থমূলে সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিলাম মাত্র।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনের পর শ্রীধাম খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ঈশ্বরী জাহ্নবা মাতা শ্রীপাট অম্বিকায় আসিয়া শ্রীগৌরী-দাস-মন্দিরে শ্রীনিতাইচৈতন্য দর্শন করিয়া বিহ্বল নয়নে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবা মাতা অম্বিকায় এক দিবস বিশ্রাম করিয়া খড়দহের পথে যাত্রা করেন। অম্বিকায় আরও দুই চারিদিন বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শ্রীনিতাইচৈতন্য আদেশে তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। একদিনের জন্যও যে ঈশ্বরী জাহ্নবা মাতার পদরজ অম্বিকায় পড়িয়াছিল, তাহাতেই অম্বিকাবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

"ঐছে দুই দিবস রহিয়া নদীয়ায়।
সরাসর ঈশ্বরী গেলেন অম্বিকায়॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যর করিলা দর্শন।
হইয়া বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ॥
একদিন অম্বিকায় রহি প্রেমাবেশে।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ চৈতন্য আদেশে॥
খড়দহ গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইল।
ঈশ্বরী গমন ধ্বনি সর্ব্বত্র হইল॥"

-- ভক্তিরত্নাকর

ধন্য গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর! তোমার প্রাণের ঠাকুর শ্রীনিতাই-চৈতন্যকে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছ বলিয়া আজ তোমার শ্রীআঙ্গিনা কত-শত পরম বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের পদস্পর্শে পূত হইয়া আছে এবং হইতেছে। তোমার শ্রীআঙ্গিনার এই রজ ভক্তিসহকারে দেহে মাখিলেই দেহ নিষ্পাপ ও কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়।

শ্রীহৃদয়-চৈতন্য তাঁহার শ্রীগুরু গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সেবা প্রাণ ভরিয়া করিলেন। তিনিও সর্ব্বজীবে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে নিত্য নূতন আনন্দধারা বহিতে লাগিল। বহু ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে ঠাকুর-সেবা ও ভজন করিয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য তাঁহার এক প্রিয় এবং উপযুক্ত শিষ্য শ্রীগোপীরমণ ঠাকুরের হাতে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের সেবাভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নাম জপ করিতে করিতে ৺ধামে গমন করিলেন। শ্রীগোপীরমণ ঠাকুরও পরমগুরুর সেবা মন-প্রাণ সহকারে করিতে লাগিলেন। মহুলাগ্রাম নিবাসী শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কৃষ্ণ-ভক্ত আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বোরাকুলীগ্রামে আসিয়া বসবাস করিলেন। এই ভক্তপ্রবর শ্রীগোবিন্দ গীতবিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। বোরাকুলিগ্রামে আসিয়া বাস করিবার পর তিনি নিজ গুরু আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুরকে আনিয়া সেই গ্রামে এক বিরাট মহোৎসব কার্য্য সম্পন্ন

করেন। বহু ভক্ত, বৈষ্ণব এবং শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুও নিজ শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আমাদের পরম ভক্ত গৌরগতপ্রাণ শ্রীল গোপীরমণ ঠাকুরকে নিমন্ত্রিত হইয়া সেই মহোৎসবে যোগদান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

"শ্রীগোবিন্দ ভবনে আনন্দ উথলিল।
সবা সহ আচার্য্যের গমন হইল॥
মহামহোৎসব আয়োজন করাইলা।
সর্ব্বত্রেই নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা।
আইলেন বীরচন্দ্র নিজগণ সনে।
কৃষ্ণমিশ্র আইলা বেষ্টিত নিজগণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।
অম্বিকা হইতে তিঁহ করিলা গমন॥"

—ভক্তিরত্নাকর•

— চতুর্থ উচ্ছ্বাস —

সে আজ প্রায় আন্দাজ দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদিন প্রাতে শ্রীগৌরীদাস মন্দিরের তৎকালীন্ সেবাইত শ্রীল গোরাচাঁদ ঠাকুর শ্রীমন্দিরের ভিতর যখন শ্রীনিতাই-চৈতন্য পূজায় রত ছিলেন, সেই সময় পরম তেজস্বী জনৈক বৈষ্ণব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দরজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"দ্বার খুলিয়া ত সব জায়গায় দর্শন দেওয়া হয়; আপনা আপনি দ্বার খুলিয়া যাইয়া কোথাও কি দর্শন পাওয়া যায় না?" পরম শক্তিমান্ এই বৈষ্ণব এই কথা বলিবামাত্র শ্রীগৌরীদাসের শ্রীনিতাইচৈতন্যের সম্মুখের দরজা আপনা হইতে খুলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া পূজারত সেবাইত শ্রীল গোরাচাঁদ ঠাকুরের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, শ্রীগৌরীদাস যাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আজ তাঁহারই কৃতকর্ম্মের দোষে বোধ হয় তাঁহারা শ্রীমন্দির হইতে চলিয়া যাইতেছেন; কারণ যে বৈষ্ণবের এত বেশী শক্তি যে, শ্রীমন্দিরের দ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেল, সে বৈষ্ণব যে প্রভুদের দর্শন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে পারেন ইহা সুনিশ্চিত। তিনি তখন শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত অপর কিছুরই সাহায্য দেখিলেন না। সেই জন্য তিনিও তখনই দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"যদি গৌরীদাসের প্রাণের ধন হও তবে

দরজা এখনই বন্ধ কর।" হরি হরি বল! ভক্তের ভগবান্ আর কি করিবেন;—নিজে দ্বার খুলিয়া ত আর চলিয়া যাইতে পারেন না;—অথচ এই পরম বৈষ্ণবকে শ্রীগৌরী দাসের প্রেমশক্তির পরিচয় না দিলেও নহে,—সেই জন্য শ্রীগোরাচাঁদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া ঐ দরজা তখনই আপনা হইতে আবার বন্ধ হইয়া গেল।

এই পরম শক্তিমান্ বৈষ্ণব হইতেছেন শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়। শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ অলৌকিক শক্তি কোথাও তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়ে নাই। সেই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তিনি অম্বিকায় থাকিবেন। সেই দিন হইতে তিনি অম্বিকায় বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরীদাস মন্দিরের আঙ্গিনার পার্শ্বেই শ্রীগৌরীদাসের "গিরিধর" বলিয়া একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী সংস্কারের সময় শ্রীগৌরীদাস মন্দিরের তৎকালীন সেবাইতকে স্বপ্নাদেশ দানে এই পুষ্করিণী হইতে "শ্রীযাদব রায়" ও শ্রীমাধব রায়" নামে মহাদেবের দুই মূর্ত্তি উঠিয়াছিলেন। প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ দুই মহাদেব মূর্ত্তির চড়ক উৎসব সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রীগৌরদাস সেবাইতগণ তাঁহাদের একটি নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মত গণ্য করিয়া আসিতেছেন। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাহাড়ে দুই

চারিটি "গম্ভীরা" প্রস্তুত করান ছিল। অভ্যাগত, সাধু কেহ সেখানে থাকিবার ইচ্ছা করিলে থাকিতে পারিতেন।

শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় সেই দিন হইতে "গম্ভীরার" একটিতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে "গম্ভীরাতে" বাস করিতেন, তাহার একটু ভগ্নাংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। তিনি প্রত্যহ উচ্চৈঃস্বরে লক্ষাধিক "নাম" জপ করিতেন। তিনি তারক-ব্রহ্ম নামে "সিদ্ধ" হইয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে আজও "সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী" বলিয়া অভিহিত করে। লোকে যখন তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে দেখিত, তখনও তাঁহার জিহ্বা হইতে "হরে কৃষ্ণ" নান স্পষ্ট শুনিতে পাইত। নাম জপ করিয়া তাঁহার হাতের দশ আঙ্গুল অভ্যাস মতে সর্ব্বদাই সঞ্চালিত হইত। তিনি কখনও কাহারও প্রণাম গ্রহণ করিতেন না। তিনি যখন রাস্তায় বাহির হইতেন, তাঁহার গাত্রের কন্থা (কাঁথা) পশ্চাৎ দিকে মাটি পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিতেন ; তাহাতে পথের ধূলার উপর তাঁহার চরণের যে চিহ্ন পড়িত তাহা মুছিয়া যাইত। তিনি চলিয়া যাইবার পর তাঁহার সেই চরণ-চিহ্ন হইতে যাহাতে কেহ রজ লইতে না পারে এই নিমিত্ত তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি গঙ্গার ধারে গিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গঙ্গাদেবী তাঁহার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইতেন, ততক্ষণ তিনি মা

গঙ্গার দিকে সমুখ ফিরিয়া পাছু হাঁটিয়া রাস্তা চলিতেন। মা গঙ্গাকে পশ্চাৎ করিয়া তিনি কখনও চলেন নাই।

কিছুকাল অম্বিকায় বাস করিবার পর কোনও ভগবৎ-সেবা প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের একদিন ইচ্ছা হইল। কি সেবা প্রতিষ্ঠা করেন, কিছুদিন ইহা চিন্তা করায়,—একদিন তাঁহার উপর "আদেশ" হইল,—"নামই ব্রহ্ম—অতএব এই 'নাম-ব্রহ্ম' ঠাকুর প্রতিষ্ঠা কর।" একদিন মা-জাহ্নবা গঙ্গার চড়ায় ভক্তগণকে আহার করাইবার নিমিত্ত রন্ধন করিতেছিলেন; রৌদ্রতেজে ভক্তগণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া, তিনি যে "মোচকন্দ" গাছের সরু কাঠের দ্বারা "দাইল" পাক করিতেছিলেন, সেই দাইলের কাঠি গঙ্গার চড়ায় পুতিয়া দেন এবং সেই কাঠি ভগবৎ-লীলা কৃপায় সঙ্গে সঙ্গে ঘন পত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড গাছ হইয়া ভক্তগণকে ছায়া দান করে। কালে সেই বৃক্ষ গঙ্গা গর্ভে পতিত হয়। আলোচ্য সময়ে সেই বৃক্ষের কিঞ্চিৎ মাত্র সারাংশ গঙ্গার ভাঙ্গন মুখে বাহির হইয়াছিল। সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের উপর, সেই "মোচকন্দ" বৃক্ষের সারাংশটুকু আনিয়া তাহার উপর "হরেকৃষ্ণ" নাম খোদিত করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিবার আদেশ হয়। অদ্ভুত ভগবৎ-লীলা! যে শুনিবে সেই বলিবে, "মোচকন্দ" গাছের আবার সার? তাহাও আবার বহু শত বৎসর মাটির ভিতর ছিল! শ্রীভগবানের লীলায় সবই সম্ভব। বাবাজী মহাশয় বর্দ্ধমানাধিপতির

অম্বিকা বাজারের ঠিক পশ্চিম দিকে কিছু জায়গা সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া "নাম-ব্রহ্ম" ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে তিনি "গম্ভীরা" ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্দিরে ভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীনাম ব্রহ্ম ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত অনেক ভক্ত শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয়কে কিছু কিছু স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। বাবাজী মহাশয় একটি "উইল" করিয়া তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "নাম-ব্রহ্ম" ঠাকুরের সেবাইত শিষ্যগত ভাবে হইবেন, যদি কোনও সেবাইত উপযুক্ত না হয়েন কিম্বা শিষ্য সেবাইত নিযুক্ত না করিয়া দেহ-রক্ষা করেন, তবে তৎকালীন শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীমন্দিরের সেবাইতগণই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই "ঠাকুরের" সেবাইত ও পরিচালক হইবেন। শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবিষ্ণুদাস বাবাজী নামক তাঁহার জনৈক শিষ্যকে সেবাইত নির্দ্ধারিত করিয়া ভজন করিতে করিতে সন ১২৯০ সালের আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ৺ধাম প্রাপ্ত হয়েন। "শ্রীনাম ব্রহ্ম" ঠাকুরের আঙ্গিনায় বাবাজী মহাশয়কে সমাহিত করা হয়। তাঁহার "শ্রীনাম-ব্রহ্ম" ঠাকুর ও সমাজ বহু ভক্ত দর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাট অম্বিকায় আসিবার দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত দৈনিক শ্রীশ্রীগৌরীদাসের শ্রীশ্রীনিতাইচৈতন্যের অন্নপ্রসাদ ব্যতীত শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয় অপর অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

অদ্যাপিও বাবাজী মহাশয়ের সমাজে ভোগ দিবার জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুজীউ ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ দৈনিক মধ্যাহ্নে পাঠান হয়।

কথিত আছে যে, শ্রীভগবানদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে একদিন সমাধিস্থ অবস্থায় বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার অদ্ভূত শক্তির কথা শ্রবণে তৎকালীন বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহাকে দর্শন করিতে সেই স্থানে গমন করেন। মহারাজাধিরাজ উপস্থিত হইবা মাত্র বাবাজী মহাশয় "হেট্ হেট্" শব্দ করিয়া উঠিলেন। মহারাজাধিরাজ মনে করিলেন, তিনি "বিষয়ী" লোক বলিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহার সাহচর্য্য পছন্দ না করায় ঐরূপ করিয়া উঠিলেন। মহারাজ কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। বাবাজী মহাশয়ের সমাধিভঙ্গের পর উপস্থিত ভক্তগণ তাঁহাকে মহারাজ আসিবার ঘটনা সমস্ত বলিলেন। বাবাজী মহাশয় তখন হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি মহারাজ আগমনের বিষয় কিছুই জানেন না, তিনি তখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরের তুলসী গাছ ছাগলে খাইতেছিল বলিয়া সেই ছাগল তাড়াইতে গিয়াছিলেন। এই কথা তৎক্ষণাৎ মহারাজকে জানান হইলে, মহারাজ "টেলিগ্রাফ" যোগে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে খবর আনাইয়া জানিলেন, "হ্যাঁ, একজন বৃদ্ধ বাবাজী সেই ছাগল তাড়াইয়াছেন এবং সেই বাবাজীকে তাঁহারা কখনও

দেখেন নাই।" মহারাজার ভক্তি তখন বাবাজী মহাশয়ের উপর আরও দৃঢ় হইল।

শ্রীবিষ্ণুদাস বাবাজী মহাশয় কিছুদিন "নাম-ব্রহ্ম" ঠাকুরের সেবা পূজা করিবার পর এক অতি অল্প বয়স্ক শিষ্যকে সেবাইত মনোনীত করিয়া হঠাৎ দেহ রক্ষা করেন। সেই অতি অল্প বয়স্ক সেবাইতও হঠাৎ পরলোক গমন করিলে, "শ্রীনাম-ব্রহ্ম" ঠাকুরের উপযুক্ত সেবাইত না থাকায়, ঠাকুর-সেবা কিছুদিন বড়ই গোলযোগের সহিত হইতে থাকে এবং সেই সময় ঠাকুরের অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহাশয়ের "উইলে" লিখিত ইচ্ছা অনুসারে বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীগৌরীদাস শ্রীমন্দিরের সেবাইতগণ "শ্রীনাম-ব্রহ্ম" ঠাকুরের সেবাইতরূপে নিযুক্ত আছেন। "শ্রীনাম-ব্রহ্ম" ঠাকুরের এবম্প্রকার আর্থিক দুরবস্থা হেতু বর্ত্তমান সেবাইতগণ শ্রীপাট অম্বিকার ব্যবসাদারগণের সাহায্য চাহিলে তাঁহারা সকলে একযোগে "৵বৃত্তি" স্থাপনার দ্বারা তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েক জনকে "ট্রাষ্টি"-রূপে নিরূপিত করিয়া ঠাকুরের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। যে অম্বিকার রজের প্রতি কণা অনুকণা কৃষ্ণপ্রেম মিশ্রিত, সেই অম্বিকার পরম ধর্ম্মপ্রাণ ব্যবসাদারগণ যে এই মহত্ব প্রকাশ দ্বারা প্রাচীন স্মৃতি ও সিদ্ধ সেবা রক্ষা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে? শ্রীভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিবেন,—ইহা সুনিশ্চিত।

শ্রীপাট-অম্বিকায়

শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর-শ্রীমন্দিরের

সিংহদ্বার ও তদুপরি রাস-মঞ্চ।

মোগল রাজত্বকালে তৎকালীন শ্রীশ্রীল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীশ্রীগৌরীদাসের সেবার সাহায্য কল্পে কিছু জমি দান করিয়াছিলেন এবং মাসিক দশ টাকা কিম্বা তদুপযুক্ত "সিধা" অদ্যাপিও বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর দান করিতেছেন। শ্রীশ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভু মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিয়া তাঁহাকে চির-উন্নতি এবং দীর্ঘ জীবন দান করুন, ইহাই সর্ব্বদা প্রার্থনা করি। ঢাকা নবাবপুর নিবাসী পরম বৈষ্ণব মদনমোহন পাল মহাশয় প্রভুর শ্রীমন্দির ও নাট-মন্দিরের মেঝে মর্ম্মর প্রস্তরের করিয়াছেন। অম্বিকা নিবাসী দাতা ও বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভুর সিংহদ্বার সংস্কার করিয়া তাহার উপর একটি পাকা দালান তৈয়ারী করাইয়া দিয়া জনসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রভুর প্রাচীন "রাস-মণ্ডল" ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ঐ দ্বিতল দালানের উপর প্রভুর রাস-লীলা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উক্ত পরম বৈষ্ণব ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান্ পঞ্চানন সাবুই, নিজ কর্ম্ম-সময়ের যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক রূপে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে উক্ত শ্রীশ্রীনাম-ব্রহ্ম ঠাকুরের সর্ব্ব বিষয় বৈষয়িক কার্য্য সুন্দররূপে ব্যবস্থা করিয়া নিজের মহান্ ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করি,— তিনি সারা জীবন এই মহান্ ব্রতে ব্রতী থাকিয়া দীর্ঘ জীবন

লাভ করুন ; এই কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পরিবার বর্গের সকলেরই ঐহিক ও পারত্রিক, উভয় প্রকার মঙ্গলই সাধিত হইবে। সুদূর ব্রহ্মদেশের "মণ্ডালে" নিবাসী শ্রীচন্দ্র সিং নামক জনৈক পরম ভক্ত বহু অর্থব্যয়ে একটি প্রকাণ্ড ইন্দারা খনন করাইয়া দিয়া প্রভুদর্শনে সমাগত ভক্তগণকে তথা স্থানীয় পল্লীবাসিগণকে প্রচুর জলদান জনিত মহাপুণ্য অর্জ্জন করিতেছেন। উক্ত ৺মদন মোহন পালের উপযুক্ত পুত্র পরম বৈষ্ণব শ্রীরজনীকান্ত পাল মহাশয় প্রভুর শ্রীমন্দিরের বাহির দিকে সম্মুখ ভাগের পাত্রে "মিণ্ট টাইলের" কার্য্য করাইয়া উহা সুরম্য করিয়া দিয়াছেন। কালনা থানার অন্তর্গত চা-গ্রাম নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ উকিল শ্রীরজনীকান্ত কুমার মহাশয় প্রভুর নাট-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের বারান্দা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। আজ প্রায় সাড়ে চারি শত বৎসরের মধ্যে বহু ভক্ত বহু প্রকারে শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত সেবাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন, সকলের নাম আমার না জানা হেতু এবং ভ্রম ও অজ্ঞানতাবশতঃ প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না ; আমার অজ্ঞানকৃত ত্রুটি ভক্তগণ, পরম বৈষ্ণববৃন্দ যেন মার্জ্জনা করেন।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভোর রাত্রে শ্রীশ্রীগৌরীদাস শ্রীমন্দিরের তৎকালীন সেবাইত শ্রীল গোরাচাঁদ ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নাদেশ করিলেন,— "আমি বেড়াইতে গিয়া আমার খড়ম ফেলিয়া আসিয়াছি,

সেই খড়ম খুঁজিয়া আন।” স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঠাকুর মহাশয় সেই শেষ রাত্রেই স্নান করিয়া শ্রীমন্দিরে গেলেন। ওদিকে তৎকালীন শ্রীমন্দিরের এক বৃদ্ধ পূজারীকেও একই সময়ে স্বপ্নাদেশ হইয়াছিল। সেই বৃদ্ধ পূজারীও স্নান করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীমন্দিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীল গোরাচাঁদ ঠাকুরের সহিত বৃদ্ধ পূজারীর দেখা হইতেই উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন যে, ব্যাপার একই। তখন শ্রীমন্দিরের দ্বার খুলিয়া উভয়ে দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এক পাটি খড়ম নাই। অনুসন্ধানের জন্য দুই জনে শ্রীমন্দির আঙ্গিনায় আসিলেন। এদিকে একজন “পাইক” প্রায় ভোর হইয়াছে দেখিয়া মুখ হাত ধুইতে বাহির হইয়া আঙ্গিনা মধ্যস্থিত রাস্তায় সেই খড়ম কুড়াইয়া পাইল। খড়ম পাইয়া সে মনে করিল, উহা নিশ্চয় তাহার মনিব শ্রীগোরাচাঁদ ঠাকুরের। সেই জন্য উহা মাথায় লইয়া সে শ্রীমন্দিরের দিকে আসিতেছিল। আঙ্গিনা হইতে খড়ম মাথায় পাইককে দেখিয়া শ্রীল গোরাচাঁদ ঠাকুর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“তুই কি ভাগ্যবান্ রে! তুই আমার আগে প্রভুর খড়ম মাথায় করিয়া আনিলি—আর আমি পারিলাম না। তুই আমার প্রভুর কৃপাপাত্র, আয় তুই আমার বুকে আয়।” স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই খড়ম ফেলিয়া আসিয়াছেন জানিয়া পাইক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে পাইকের

জ্ঞান হইল। তখন শ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে আনন্দধ্বনি উঠিল।

আমার দাদামহাশয় শ্রীগৌরীদাস শ্রীমন্দিরের সেবাইত শ্রীগৌরগত-প্রাণ শ্রীল আনন্দলাল গোস্বামী মহাশয় আজ অল্পকাল হইল সুপ্রাচীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ভজন করিতে করিতে ৭৫ বৎসর বয়সে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে শ্রীগৌরীদাস শ্রীমন্দিরের বহু প্রকার লীলা বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে অনেক বিষয় দিতে পারিলাম না। আমার উক্ত দাদা প্রভুর ন্যায় ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-প্রাপ্ত পরম বৈষ্ণবগণ যে আজিও শ্রীগৌর লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন,—ইহা অতি সত্য।

এই মত শ্রীশ্রীগৌরীদাস-মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্য প্রভু কত যে নিত্য নূতন লীলা প্রকাশ করিতেছেন তাহা ব্যাখ্যা করা কোনও মানব-শক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

শ্রীপাট-অম্বিকায়

শ্রীশ্রীগৌরীদাস-শ্রীমন্দিরে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভু-দর্শনে সমাগত

ভক্তের জন্য ইন্দারা।

দণ্ডায়মান অবস্থায়—লেখক।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং।

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর নিজের শ্রীমুখের বাণী)

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনং॥ ১

নাম্নামকারি বহুধা নিজ-সর্ব্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪

অয়ি নন্দতনূজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫

নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬

যুগায়িতং নিমেষণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব
নাপরাঃ ॥ ৮

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মুখাব্জ-বিগলিতং
শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণং।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের অনুবাদ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু জীব শিক্ষার জন্য নিজে যে আটটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত। ভক্ত-জনের পরিতৃপ্তি হেতু তাহার মর্ম্মানুবাদ দিবার চেষ্টা করিলাম। আশা করি ইহা ভক্তের প্রাণে আনন্দ দান করিবে।

১ম শ্লোক :—

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ইহার বর্ণনানুবাদ করিয়াছেন,—

> "সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
> চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥
> কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
> কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
> উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।
> যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥"

যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন মনের ময়লা পরিষ্কার করতঃ মনকে নির্ম্মল, পবিত্র, সুস্থ এবং উজ্জ্বল করে, যে শ্রীনাম—সঙ্কীর্ত্তন নিখিল বিশ্বের ত্রিতাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করতঃ জীবকে মুক্তির পথে লইয়া যায়, যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন জীব-জগতের সকল প্রকার মঙ্গল সাধন করে, যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন পরম তত্ত্বজ্ঞান

প্রদান করতঃ জীবের আনন্দ-সাগর সদা পরিবর্দ্ধন করে, যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অমৃত-রসের পূর্ণ আস্বাদন প্রদান করতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে,—সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বস্তু রূপে বিরাজ করিতেছেন ;—অতএব জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের জয়।

২য় শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥"

হে পরমকৃপাময় ভগবান্! বিভিন্ন রুচির জীবের জন্য তুমি তোমার বিভিন্ন রূপ বহু সংখ্যক নামের প্রবর্ত্তন করিয়া সেই সকল নামে তোমার পূর্ণ শক্তি প্রদান করিয়াছ এবং সেই সকল নাম লইবার জন্য স্থান কালেরও কোন নিয়ম কর নাই অর্থাৎ যে কোনও স্থানে যে কোনও সময়েই শ্রীনাম করিতে পারা যায়,—তাহার কোনও বিধি নিষেধ নাই। হে দয়াময়! তোমার এত দয়া স্বত্বেও আমার এত দুরাদৃষ্ট যে, তোমার ঐ সকল কোনও নামেই আমার রুচি জন্মিল না।

৩য় শ্লোকঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

"যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নীরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজায়॥"

তৃণ অপেক্ষাও নীচ হইয়া বৃক্ষের মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্ব জীবে সম্মান প্রদান করতঃ সর্ব্বদা হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে হইবে।

তৃণ অপেক্ষা (ঘাসের চেয়ে) নীচ হওয়া মানে—

ঘাসের উপর পা দিলে ঘাস নীচু হইয়া যায় বটে কিন্তু পা সরাইয়া লইলে ঘাস আবার সোজা হইয়া উঠে। বৈষ্ণবকে অত্যাচার, কটূক্তি, নিন্দা এমন কি দৈহিক নির্য্যাতন

পর্য্যন্ত অম্লান বদনে সহ্য করিতে হইবে এবং সেই অত্যাচারী চলিয়া যাইলে, তাহার অসাক্ষাতেও তাহার নিন্দা কিম্বা তাহার কার্য্যের কোনওরূপ সমালোচনা বা প্রতিবাদ করা চলিবে না ; অর্থাৎ অত্যাচারীর অসাক্ষাতেও তাহার কার্য্যের নিন্দা না করা,—ঘাসের চেয়ে নীচু হওয়া।

গাছের মত সহিষ্ণুতা, মানে—

গাছকে যখন কাটিয়া ফেলা হইতেছে, তখনও গাছ যেমন কিছু বলে না, উপরন্তু ছায়া দান করে ; জল অভাবে শুকাইয়া মরিতে চলিলেও যেমন কাহার নিকট জল চাহে না অপিচ সামর্থ্য মত তখনও ফল ফুল দান করে ;—সেই মত বৈষ্ণবের পক্ষে অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে অত্যাচারীর উপকারে মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে হইবে ; খাদ্য অভাবে কষ্ট পাইলেও কাহারও নিকট যাচ্ঞা করা হইবে না, অযাচিত ভিক্ষা দ্বারা অভাবে বন্য শাক ফল সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে।

অমানী ব্যক্তিকে সম্মান করা, মানে—

নিজে সর্ব্বদাই নীরভিমান হইয়া পাপাচারীর আত্মাতেও শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন জ্ঞানে তাহাকেও সম্মান করিতে হইবে। কখনও কোন প্রকারেও তাহাকে ঘৃণা করা চলিবে না ; অর্থাৎ কু-কর্ম্মের জন্য সমাজ এবং জনসাধারণের নিকট উপেক্ষিত, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত ব্যক্তিও কোন কার্য্যের জন্য

নিকটে আসিলে, তাহারও সহিত সম্মান সহকারে প্রয়োজন মত আলাপ করিতে হইবে।

সর্ব্বদা হরিনাম করা, মানে—

আসন, কোশা-কুশি, ধূপ-ধূনা প্রভৃতি লইয়া বেশ করিয়া "সাজগোছ" সহকারে না বসিলে যে হরিনাম করা হইবে না,—এমন নহে। হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিবার কোনরূপ বাঁধাবাঁধি সময়, স্থান কিম্বা নিয়ম নাই। যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যখন তখন হরিনাম যখন করিতে পারা যায়, তখন আর ভাবনা কি? সব সময়েই হরিনাম অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বদাই হরিনাম অভ্যাস করিতে পারিলে, শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দেবতাবাঞ্ছিত প্রেমভক্তি লাভ করিয়া চিরানন্দ-সাগরের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরমরসিক ভক্তপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের রসাল ভাষায় এই শ্লোকের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দ-রসে ভাসিতে থাকুন :—

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে কভু জল না মাগয়॥

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে॥
সদা নাম লভে যথা নামাতে সন্তোষ।
এইমত আচার করি ভক্তি ধর্ম্ম পোষ॥

—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

৪র্থ শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

"ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগোঁ 'দাস্য ভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান॥"

হে জগদীশ্বর! আমি পার্থিব জগতের ধন, মান, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কিছুই কামনা করি না; সুন্দর কবিতা লিখিবার ক্ষমতাও চাহি না,—অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর কাব্য, মহাকাব্য প্রভৃতি লিখিয়া লোক যেমন ইহ জগতে অমর হইয়া থাকে, সেইরূপ অমরত্বও আমি চাহি না; কেবল এই চাই, যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কামনাহীন প্রেমভক্তি লাভ হয়।

৫ম শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

তোমা নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥

কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

হে নন্দ-সূত! আমার ন্যায় তোমার একজন ক্ষুদ্র দাসানুদাস আজ ভব-সাগর-বিপাকে পড়িয়াছে; আমাকে তোমার শ্রীচরণ-রজের মত মনে কর, আমাকে কৃপা করিয়া তোমারই সেবায় নিয়োজিত কর। তোমার সেবায় রত থাকিয়া আমার আত্মা সুশীতল হউক।

৬ষ্ঠ শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

হে গোবিন্দ! তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে কবে আমার চক্ষু আনন্দধারায় বিগলিত হইবে, কণ্ঠ গদ-গদ ভাবে রুদ্ধ হইবে এবং শরীর পুলকশিহরণে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে?

৭ম শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

"উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ হইল যুগ-সম।
বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥"

সখি হে ! শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অতি অল্প সময়ও আমার নিকট যেন যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, বর্ষাধারার ন্যায় আমার চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুবারি ঝরিতেছে এবং আমার নিকট সমস্ত জগৎ শূন্যময়রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

৮-ম শ্লোক ঃ—

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে,—

"আমি [illegible] দাসী,
তিঁহ রস সুখ রাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ;
কিবা না দেন দরশন,
না জানে আমার তনু মন,
তভু তেঁহ মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে,
কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ,
মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা সবারে দেন পীড়া,
আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥

কিবা তিঁহ লম্পট,
শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করে সাথ।
মোরে দিতে মনপীড়া,
মোর আগে করে ক্রীড়া,
তভু তিঁহ মোর প্রাণনাথ ॥"[১]

হে সখি ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণতলে আমাকে আশ্রয়ই দিন কিম্বা তাঁহার শ্রীচরণের দ্বারা আমাকে পেষণই করুন ; তাঁহার অদর্শনে আমার মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্নই হউক অথবা সেই লম্পট আমাকে পরিত্যাগান্তে অপর রমণীর নিকট গমনই করুন,—তাঁহার ইচ্ছামত আমার সহিত যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন,—তথাপি তিনিই আমার একমাত্র প্রাণেশ্বর, অপর কেহই নহে।

সমাপ্ত